বিষয়সূচি

1.	বাউলনারীর জীবনদর্শন: কিছু কথা *অর্ঘ্য ব্যানার্জী*	01-09
2.	রবীন্দ্রভাবনার বাউল সংস্কৃতির অনুষঙ্গ : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ *ড. অগ্নিমিত্রা পাণ্ডা*	10-13
3.	"মিলন হবে কতোদিনে" বাংলার বাউল ও বাউল সঙ্গীত চর্চার পর্যালোচনা *সৌমিতা মিত্র*	14-21
4.	রবীন্দ্র ভাবনায় ধর্ম : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা *জগবন্ধু সরকার*	22-27
5.	বাউল বৈষ্ণব ও রবীন্দ্রনাথ *ড. ইয়াস্মীন আরা লেখা*	28-37
6.	বাউলগানে মনের মানুষ ও মানবতাবাদ *ডঃ মুকুল মণ্ডল*	38-44
7.	বাঙলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সময়ের সাথে তার বিবর্তন: কিছু কথা *ডঃ প্রদীপ্ত আচার্য*	45-54
8.	মধ্যযুগীয় চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে গৌর-গদাধর প্রসঙ্গ *দীপঙ্কর ঘোষ*	55-61
9.	রবীন্দ্র সাহিত্যে ও সঙ্গিতে বাউল গানের প্রভাব *জয়তী মাইতি*	62-67
10.	"বাউল বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ" *মৌসুমী দাস*	68-75
11.	সামাজিক জ্ঞাপনে লোকসংস্কৃতির প্রভাব *ড: মৌমিতা চৌধুরী, মনামী চৌধুরী ও ইন্দ্রাণী সরকার*	76-96
12.	রবীন্দ্র ছোটগল্পে (নির্বাচিত) বৈষ্ণব অনুষঙ্গ: একটি সমীক্ষা *বর্ণালী পাল*	97-103
13.	রবীন্দ্র কবিতায় সসীম ও অসীম লোকের সমন্বয় সাধনে বৈষ্ণব ও বাউল দর্শনের প্রভাব *সুশান্ত মণ্ডল*	104-111
14.	আত্ম অন্বেষণে বাউলদর্শন *ড. কোহিনূর বেগম*	112-119

বাউল বৈষ্ণব ও রবীন্দ্রনাথ
ড. ইয়াস্মীন আরা লেখা

বাউল: 'বাউল নামের উৎপত্তি নিয়ে ফোকলোরবিদের মধ্যে মতভেদ আছে। 'বাউল' চৈতন্যচরিতামৃতে 'ক্ষেপা' ও 'বাহ্যজ্ঞানহীন' অর্থে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ প্রথম লক্ষ করা যায়। কারো কারো মতে, এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, পাগল প্রভৃতি অর্থে 'বাউর' থেকে বাউল নামেরর উৎপত্তি। কারো কারো মতে, এ মতের উদ্ভব যুগে দীন-দুঃখী, উলঝুল একতারা বাজিয়েদেরকে লোকে 'বাতুল' বলে উপহাস করত। এ বাতুল থেকে 'বাউল' নামের উদ্ভব। আবার কেউ কেউ মত প্রকাশ করে বলেছেন, 'বায়ু' শব্দের সঙ্গে 'ল' যুক্ত হয়ে বায়ুভোজী উন্মাদ কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা সাধনকারী অর্থে 'বাউল' শব্দ তৈরি হয়েছে। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বাউল শব্দটি 'আউল' শব্দজ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, 'আউল' 'আউওলিয়া যা ওলির বহুবচন হতে উদ্ভূত। আবার বাউল মতের আদি প্রবর্তক বলে খ্যাত ব্যক্তির নাম আউল চাঁদ। তাই আউল চাঁদের অনুসারিরা 'আউল' বলে পরিচিত হওয়া সম্ভব। ড.এস. এ. লুৎফর রহমানের মতে বজ্রী-বাজ্জির-বাজির-বাজ্জিল-বাজুল-বাউল।

বাউল মতে আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন অর্থাৎ আত্মা পরত্মার অংশ। আত্মাকে জানলে পরমাত্মাকে জানা হয়। এই দেহস্থিত আত্মাই মানুষ, মনের মানুষ, রসের মানুষ, ভাবের মানুষ, অলখ বা আলেক সাঁই। আর বাউলেরা যুগে যুগে করেছেন তার অনুসন্ধান। লালন শাহের গানে পাওয়া যায়:

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।।

আর এই সব আত্মার মধ্যে পরমাত্মার বা ঈশ্বরের অনুসন্ধানী বাউল সূফিদের গানে জীবাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করেছেন পরমাত্মা বা অধর মনের মানুষকে।

লালন বাল্যকাল থেকেই ধর্মপরায়ণ ও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। যখনই কেউ তাঁর জাতি-ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন তিনি হেয়ালিভাবে তার জবাব দিয়ে বলতেন,

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসার।

লালন কয়, জাতের কি রূপ, দেখলাম না এ নজরে।।[২]

বৈষ্ণব: 'বৈষ্ণব' শব্দ দ্বারা 'বিষ্ণুভক্ত' বোঝায়। বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে বিষ্ণু পূজার কোনো ব্যাপার নেই। বৈদিক যুগে ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ, বায়ু প্রভৃতি দেবতাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তাঁদেরই শুধু পূজা করা হতো। এই পূজা ছিল আনুষ্ঠানিক যজ্ঞকার্য-আদান প্রদান-যার মুখ্য উদ্দেশ্য। এর সঙ্গে বিশুদ্ধ ভক্তিভাবের কোন সম্পর্ক ছিল না।

পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। যথা-ভগবত, ভক্র, বৈষ্ণব, পঞ্চরাত্র, বৌখমাস, কর্মহীন, শ্রী, সাধনা, রুদ্র, সাধক। বিভিন্ন সম্প্রদায় আপন আপন রীতি পদ্ধতিতে বিষ্ণু বাসুদেব নারায়ণ কৃষ্ণকে পূজা করতেন, তাঁদের সাধনা পদ্ধতিও ছিল জটিল।

শ্রী চৈতন্য দেব এসে বৈষ্ণব ধর্মের নতুন তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ার এনে দিলেন। বৈষ্ণব ধর্মকে আচার অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত করে তাকে সহজিয়া রূপ দান করে তার এমন একটি সার্বজনীন রূপ দান করলেন যে তার জীবনকালেই এই ধর্ম হয়ে পড়ল বাংলার একটি প্রধান ধর্ম। শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত এই বৈষ্ণব ধর্মের নাম হলো- 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম'। এই ধর্মের তত্ত্বদর্শন নিয়েই গড়ে উঠল বিপুল বৈষ্ণব পদাবলী।

বৈষ্ণব ধর্ম যেহেতু কামকে প্রেম থেকে বিচ্যুত করে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণই জীবনের পরম পুরুষার্থ। সর্বতোভাবে কৃষ্ণ সেবা এবং কৃষ্ণের সন্তোষ বিধান কৃষ্ণ ভক্তের একমাত্র কাম্য। তাই তারা কামকে দেহবিলাসের প্রতীক রূপে না দেখে দেহ চেতনাবর্জিত এক পবিত্র সুন্দর ভাবানুভূতি রূপে দেখেছেন। তাদের বক্তব্যঃ আপন ইন্দ্রিয়ের স্থূল ভোগবিলাস জাত আনন্দ হলো কাম, আর কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের লীলা দর্শনজাত আনন্দ হলো প্রেম। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে-

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলখণ।
আত্মেন্দ্রিয়ে প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য মাত্র প্রেম তো প্রবল।[৩]

রবীন্দ্রনাথ: ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি বাংলাদেশ অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। একজন বাঙালি কবি হিসাবে এতদিন যাঁরা তাঁকে সাধারণের মধ্যে কিছুটা অসাধারণ ভেবেছিলেন, তাঁরাই তাঁর কবিত্বের

মধ্যে মহৎ ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। পাশ্চাত্য জগৎ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিশ্চিত অর্থের 'অসাধারণ ভাবনা'র প্রকাশ লক্ষ করে চমৎকৃত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছিলেন, গোটা পৃথিবীর সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল। বেদ, উপনিষদ সম্বন্ধেও তাঁরা অনবহিত ছিলেন না। কিন্তু রবীন্দ্র প্রতিভার যে পরিচয় সেদিন তারা লাভ করেছিলেন তার সাযুজ্য তাঁরা অন্যত্রে লক্ষ করেননি। রবীন্দ্র প্রতিভার এই পরিচয় সেদিন পাশ্চাত্যকে হতবাক এবং অভিভূত করেছিলেন। পৃথিবী মহৎ ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য জগৎ 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে একটি নতুন ভাবনা ও মৌল চেতনার প্রকাশ দেখে অভিভূত হয়েছিলেন।

সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ 'গীতাঞ্জলি'র মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষের এক মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল। 'গীতাঞ্জলি'তে স্রষ্টার যে পরিচয় বিধৃত হয়েছে তা কোনো বিশেষ ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 'গীতাঞ্জলি'র ঈশ্বর একক এবং তিনি অভিনবও বটে।

'গীতাঞ্জলি'তে যে বাণীর প্রকাশ ঘটেছে তা সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে ফল্গুধারার মতো প্রবহমান। প্রশ্ন জাগে, কবির অন্তরে এই যে বাণী তাঁর সমগ্র সাহিত্য ও সংগীতকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, এর উৎস কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথ বাউলদের মধ্যেই তা পেয়েছিলেন। এই বাউলেরা ছিলেন ইরানীয় বাতেনী সুফী ভাবধারাপুষ্ট একশ্রেণির সাধকদের উত্তরসূরি। দিওয়ানা হাফিজ, ওয়মর খৈয়াম, জুনায়েদ এই মতাদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ খুব ছেলেবেলা থেকে বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে ইরানীয় কবি হাফিজ এবং ওমর খৈয়ামের কাব্য প্রতিভা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই উপলব্ধির সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাদেশের বাউলদের সংস্পর্শে এসে। রবীন্দ্রনাথ বলেন,

> *"কয়েকদিন হ'ল পল্লীগ্রামে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাদের ধর্মের বিশেষত্ব কী আমাকে বলতে পার? একজন বললে, "বলা বড় কঠিন, ঠিক বলা যায় না। আর একজন বললে, বলা যায় বৈকি-কথাটা সহজ। আমি বলি এই যে গুরুর উপদেশে গোড়ায় আপনাকে জানতে হয় যখন আপনাকে জানি, তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম,*

তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর লোককে সবাইকে শোনাও না কেন। কেউ বললে, যার পিপাসা হবে সে আকাঙ্ক্ষার কাছে আপনি আসবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তাই কি দেখতে পাচ্ছ, কেউ কি আসছে। সে লোকটী অত্যন্ত প্রশান্ত হাসি হেসে বললে, 'সবাই আসবে। সবাইকে আসতে হবে।' আমি কথা ভাবলুম, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের শাস্ত্রে শিক্ষাহীন এই বাউল, এ তো মিথ্যা বলেনি। আসছে সমস্ত মানুষই আসছে। কেউ তো স্থির হয়ে নেই আপনার পরিপূর্ণতার অভিমুখেই তো সবাইকে বলতে হচ্ছে, আর যাবে কোথায়। ... মানুষ অন্ন-বস্ত্রের চেয়ে গভীর প্রয়োজনের জন্য পথে বেরিয়ে পড়েছে। কী সেই প্রয়োজন। তপোবনে ভারতবর্ষের ঋষি তার উত্তর দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে বাউল তার উত্তর দিচ্ছে। মানুষ আপনাকে পাবার জন্য বেরিয়েছে। আপনাকে না পেলে তার আপনার চেয়ে যিনি বড়ো আপন তাঁকে পাবার জন্য। --আমাদের বৈরাগী বাংলাদেশের একটি ছোট নদীর ধারে এক সামান্য কুটিরে বসে আপনি'র খোঁজ করছে এবং নিশ্চিন্তে হাস্যে বলছে, সবাইকে আসতে হবে এই আপনি'র খোঁজ করতে। কেন না তো কোনো বিশেষ মতের বিশেষ সম্প্রদায়ের ডাক সমস্ত মানবের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য আছে এ যে তারই ডাক।"

রবীন্দ্রনাথের মনে বাউলের গান যে তীব্র প্রভাব বিস্তার করেছিল তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"আমার লেখা যারা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি অনুরাগ আমি অনেক লেখার প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা- সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হতো। আমার মনের গানেই বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ রাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোনো এক সময় আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স- শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল—

আমি কোথায় পাব তারে

আমার মনে মানুষ যে রে!
হারায়ে সে মানুষে
তার উদ্দেশ
দেশ- বিদেশে
বেড়াই ঘুরে। [৪]

রবীন্দ্রনাথের উপর এই বাউল প্রভাব তাঁর খুব ছেলেবেলা থেকেই পড়তে শুরু করে। বোলপুরে পথে শোনা এই বাউল গানর পদ—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়। [৫]

বাউলের গান ও দর্শন রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাউল ব্যতিরেকে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ এবং বৈষ্ণব সাধনার প্রতিও বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। কিন্ত বাউল গানের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ অন্য সব কিছু থেকেই বেশি ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কোনো শাস্ত্রাচার মানেননি, কোনো নিয়মের বাঁধনে থাকতে চাননি। তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে বাউল সাধকের বিশেষ মিল ছিল। বাউল গানে রবীন্দ্রনাথ যে মুক্তির আনন্দ লাভ করেছিলেন, বলা চলে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্মে তাকেই আদর্শ বলে ভেবেছিলেন। বাউলের গান হৃদয়ের সাথে যোগ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে বলেই রবীন্দ্রনাথ তাকে একান্ত আপনার বলে ভেবেছেন। বাউল গানের মধ্যে যে যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় মেলে তার উৎস হৃদয়।

বাউল বলেন—

ক্ষ্যাপা, তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়।
আপন ঘর না বুঝে
বাইরে খুঁজে
পড়বি ধাঁধাঁয়।। [৬]

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাইনি
বাহির পানে চোখ মেলেছি
হৃদয় পানে চাইনি। [৭]

আমার সকল ভালোবাসায়,
সকল আঘাত, সকল আশায়,
তুমি ছিলে আমার কাছে,
তোমার কাছে যাইনি।[৭]

রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতার উপলব্ধি তাঁর 'অরূপানুভূতি'- যার উৎস মানব জীবন। এই মানবজীবনের সঙ্গে অরূপের মিলন সাধনের প্রয়াস সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে বিধৃত। রবীন্দ্রনাথের অরূপানুভূতি পূর্ণতা পেয়েছে বাউলদের সান্নিধ্যে। বলা চলে, রবীন্দ্র প্রতিভার পূর্ণবিকাশ সাধিত হয়েছে বাউল গানের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি;[৮]

বাউল বলেন—

কাম সাগরে পাড়ি দিয়ে কুল পাওয়াটা বিষম কথা
পাবে ইন্দ্রিয়গণ বশে রাখিলে - এটাই কোন কথার কথা।[৯]

এখানে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথে ধারণা কোনো ক্ষণিকের উপলব্ধি মাত্র নয়- এ তাঁর সমগ্র জীবনের চেতনায় ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে ও সংগীতে এই প্রভাব দিক নির্দেশনার কাজ করেছে।

বাউল সাধনায় মানবদেহ সব কিছুর আধার। দেহ এবং আত্মার পূর্ণ বিকাশে মানুষ তার মানুষের সন্ধান লাভ করে। তিনিই বাউলের সাঁই। তিনিই পূর্ণ মানব। রবীন্দ্রনাথ এই পূর্ণ মানব বা বাউলের সাঁইকে জীবন দেবতা নামে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন এই জীবন দেবতা, যিনি এক অর্থে তাঁর জীবনী শক্তি। কখনও তিনি বাল্যকালের খেলার সাথী, অথবা যৌবনের মানসী এবং যৌবন শেষে তিনিই জীবন দেবতা। তিনি চির আনন্দময়, নিত্য প্রেমিক।

সীমার মাঝে, অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।[১০]

বাউল সাধনা দেহভিত্তিক প্রেম সাধনার মাধ্যমে অধ্যাত্ম সাধনা। বলা যেতে পারে, দেহবাদী প্রেম এবং অধ্যাত্ম চেতনা বাউল সাধনায় একাকার। রবীন্দ্রনাথেও

সেই একই সুর; জীবনানুরাগ এবং অরূপ অন্বেষণ উভয়ই রবীন্দ্রনাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। বাউলের যেমন দেহ ব্যতিরেকে আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই, রবীন্দ্রনাথেও তাই।

রবীন্দ্রনাথ বাউল মনের মানুষকে মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ বলে ভেবেছিলেন। তাঁকে তিনি তাঁর 'জীবনদেবতা' বলে গ্রহণ করেছিলেন। এই 'জীবনদেবতা' স্বরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

> *"যিনি আমার সমস্ত ভালো-মন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছে তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।"*

এমন অসংখ্য গান রয়েছে যা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে রবীন্দ্র-প্রতিভা একান্তভাবেই বাউল-প্রতিভা। বাউলদের মতই রবীন্দ্রনাথ মুক্তকবি স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন, তত্ত্বের চাপে উভয়েই কখনও বাধাগ্রস্থ হননি। প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র কাব্য ও সঙ্গীতে বাউলের মতই অরূপসন্ধানী ছিলেন।

রবীন্দ্র প্রতিভা বৈষ্ণব বা বাউল আশ্রিত কিনা এ সম্পর্কে রবীন্দ্র সমালোচক ক্ষুদিরাম দাস বলেন—

> *"বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে পান, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণকে পান। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সাধনমার্গ বৈষ্ণবের বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত। একমাত্র বাউলদের সঙ্গেই তা কতক পরিমাণে তুলনার যোগ্য।"*

বাউলদের সাথে বৈষ্ণবদের যে সাদৃশ্যটুকু লক্ষ করা যায় তা শুধু এই ক্ষেত্রে যে উভয়ের ঈশ্বর 'হৃদয়ানুভবগম্য'। রবীন্দ্রনাথের সাথেও বৈষ্ণব ভাবটার মিল কেবল এইখানে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথ যে মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, লৌকিক বাউল সংগীতে তার ইঙ্গিত মেলে।

> *আমি কোথায় পাব তারে*
> *"আমার মনের মানুষ যে রে*
> *হারায়ে সে মানুষে*
> *তার উদ্দেশে*
> *দেশে বিদেশে বেড়াই ঘুরে।"*[১১]

রবীন্দ্রনাথের অরূপানুভূতি তাঁর সুগভীর মর্তপ্রীতি ও মানবিক প্রীতিকে কেন্দ্র করে গঠিত। তিনি তাঁর কবি সত্তাকে বজায় রেখে ক্রমান্বয়ে মিষ্টিক সত্তায় উপনীত

হয়েছেন। এখানে কবি ঋষি একাকার হয়ে পরিশেষে রবীন্দ্র বাউলে সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বলেন,

> *"রবীন্দ্রনাথও ছিলেন আসলে এক ক্ষ্যাপা বাউল কবি। জোড়াসাঁকোর অভিজাত পরিবারে না জন্মে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া কি পাবনায় জন্মগ্রহণ করলে তিনিও হয়তো অমনি একতারা হাতে গান গেয়ে ক্ষ্যাপার মতো ঘুরে বেড়াতেন।"*

কেননা বাউলদের অন্তরের প্রেরণা এবং রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা যে একই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির অঙ্গন শুধু জগতের মধ্যেই সীমায়িত রাখেননি, তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত ছিল অজানা, অচেনার পানে, জগতাতীত জগতে। কিন্তু দৃষ্টি প্রসারিত হলেও অসীমকে তো তাঁর সম্পূর্ণ করে পাওয়া হয়নি।

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নতুন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলে নি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগর তীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।[১২]

এখানে বলা যেতে পারে প্রথম দিনের সূর্য কবিতায় কবি যে সত্তার পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হননি, তাকে তিনি 'ছলনাময়ী' নামে অভিহিত করেছেন পরবর্তী একটি কবিতায়।

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছে আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।[১৩]

এই ছলনাময়ীকেই কবি বিদেশিনী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য়।

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী?
বলো কোন পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।
যখনই সুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু, মধুরহাসিনী—
বুঝিতে না পারি কী জানি কী আছে
তোমার মনে।[১৪]

এই বিদেশিনী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন বিদেশিনী আনাগোনা করে, কোন রহস্য সিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি, তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবীরাত্রে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই, হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি। সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ব বিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম—

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে
আমি অতিথি তোমার দ্বারে দ্বারে ওগো বিদেশিনী।

ইহার অনেকদিন পর একদিন এই বোলপুরের রাস্তা দিয়ে কে গাহিয়া যাইতেছিল—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম তাহার পায়।।[১৫]

দেখিলাম বাউলের গান ঠিক ওই একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়; মন তাহাকে চিরন্তন ধরিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু পারে না।"

রবীন্দ্রকাব্যের এই বিদেশিনী, বাউল গানের অচিন পাখি-তাঁর মনের মানুষ। এই অচিন পাখি কোনো ক্ষেত্রে অধর মানুষ বা অধরা, সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য জগৎকে প্রভাবিত করেছে।

তথ্যসূত্র:

১। লালন শাহ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও ডক্টর আহমদ শরীফ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা, ১৩৯২ মাওলা ব্রাদার্স, পৃঃ ৩১৮।

২। লালন শাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২২।

৩। অধ্যাপক চৌধুরী ও অধ্যাপক সেনগুপ্ত সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃঃ ১৬।

৪। অজ্ঞাত, মুহম্মদ আবদুল হাই ও ডক্টর আহমদ শরীফ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা, পৃঃ ৩৩৪।

৫। লালন শাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১৮।

৬। লালন শাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১৫।

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতিমাল্য, রবীন্দ্র রচনাবলী একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩১৭, পৃঃ ১৯৯।

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাঞ্জলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮।

৯। কান্ত বাউল, মুহম্মদ আবদুল হাই ও ডক্টর আহমদ শরীফ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৮।

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাঞ্জলী, রবীন্দ্র রচনাবলী একাদশ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৫।

১১। অজ্ঞাত, মুহম্মদ আবদুল হাই ও ডক্টর আহমদ শরীফ সম্পাদিত মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা, পৃঃ ৩৩৪।

১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শেষ লেখা, রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪১৭, পৃঃ ১২৩।

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শেষ লেখা, রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৪।

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড, ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকা-১৯৭২, পৃঃ ৪৪৮।

১৫। লালন শাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১৮।